International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-IV, July 2026, Page No. 19-30
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.04W.342

বরিশাল জেলার গারুড়িয়া ও খয়রাবাদের ১৯৭১ সালের গণহত্যা: কিছু স্মৃতি ও ইতিহাসের অনুসন্ধান

বিকাশ চ্যাটার্জী

প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল, বাংলাদেশ

Received: 09.06.2026; Accepted: 11.06.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Bangladesh was born as an independent state following the liberation war against West Pakistani occupied army in 1971. The liberation war of Bangladesh is the most glorious chapter in the history. The genocide of Bangladesh is one of the most brutal pre planned and widespread genocides in the world history. In 1971, genocide, the most killing of the people in East Pakistan by the West Pakistani army and their collaborators during the war of liberation began on 25 March, 1971 as operation searchlight was launched by West Pakistan (Now Pakistan) to military operation to the Bengali population of East Pakistan. No definite survey was yet been made to ascertain the exact number of people killed by the Pakistani army. Pakistani army along with the local collaborators killed three million people and raped and tortured more than 0.2 millions women only in the period of nine months. Pakistani army extended its control over the enter country and carried out brutal genocide in remote areas of East Pakistan. During liberation war, Pakistani army carried out genocide in Bakhergonj district (now Bakhergonj upazila, Barishal) which is a southern remote area of Bangladesh, a case on the villages Garuria and khayrabad in Garuria Union in particular. On the 28 May, 1971, the Pakistani army carried out genocide in the villages. The aim of his paper is to describe genocide and atrocious activities in these areas and it can bring a case study to understand the true history of genocide and it would exist genocide studies of Bangladesh.
Keywords: 1971, Genocide, liberation war, Pakistani army, Bakhergonj

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষনার পর পরই পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনাকে নসাৎ করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং ২৫ শে মার্চের কালো রাত্রের অন্ধকারে বাঙালী জাতিকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। অনেক ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাংলাদেশের সর্বত্রই পাকহানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়। এ হত্যাযজ্ঞের দোসর হিসাবে কাজ করে এদেশেরই কুখ্যাত সন্তান, রাজাকার, আলবদর বাহিনীর সদস্যরা। দীর্ঘ ৯ মাস নিরীহ জনগনের উপর পাক বাহিনীর অত্যাচার, পাক হানাদারদের সাথে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধ এবং সশস্ত্র সংগামের পর অবশেষে বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে। প্রধান প্রধান জেলা শহরগুলোর মতই দক্ষিনাঞ্চলের জেলাগুলোতেও ঐ পাক বাহিনীর অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে।

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে দখলমুক্ত করতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের রক্ত দিতে হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। এই ১১টি সেক্টরের মধ্যে বরিশাল অঞ্চল ছিল ৯নং সেক্টরের অধীন। ১৯৭১ সালে ২৫ শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা ও এর আশেপাশে আক্রমণ করে এবং এই আক্রমণ ও নির্যাতনের বিভীষিকা খুব দ্রুতই বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত বরিশাল অঞ্চলেও স্থানীয় দোসরদের সহায়তায় ব্যাপক গণহত্যা সংঘটিত হয়। এরকমই গণহত্যাস্থল বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার গারুড়িয়া ও খয়রাবাদ গ্রাম।

পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় গারুড়িয়া গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৩ জন এবং খয়রাবাদ গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৭ জন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ১ জন সহ দুই গ্রামের মোট ১১ জনকে হত্যা করেছিল।গারুড়িয়া ও খয়রাবাদ গণহত্যা স্থানীয় ও জাতীয় ইতিহাসে উপেক্ষিত হয়েছে। একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর বইতেও গারুড়িয়া ও খয়রাবাদ গণহত্যা সম্পর্কে তথ্য নেই। তাই গারুড়িয়া ও খয়রাবাদ গণহত্যা বিষয়ে সরজমিনে গিয়ে শহীদ পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণাপত্র প্রণয়ন করেছি।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমির ইতিহাস সুরক্ষার জন্য গারুড়িয়া ও খয়রাবাদের গণহত্যার একটি খন্ডচিত্রের তথ্য প্রমানাদি সংরক্ষণ করা।
২. উক্ত স্থানে সংঘটিত গণহত্যার স্মৃতি রক্ষার জন্য বধ্যভূমি সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৩. বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় গণহত্যার খবরাখবর ছেপে বইপত্র জার্ণাল ও ম্যাগাজিনের সাহায্যে গবেষণা পরিচালনা করা।

গবেষণা পদ্ধতি:

১. বাকেরগঞ্জ জেলার হিন্দু অধ্যূষিত গারুড়িয়া ও খয়রাবাদসহ অন্যান্য গ্রামে ১৯৭১ সালের ২৮ মে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত শহীদদের জরিপ করে নামের তালিকা সংগ্রহ করা।
২. নিহত শহীদদের পরিবারের সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরির জন্য এলাকার বয়স্ক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা।
৩. স্থানীয় সরকারি প্রশাসনের কাছে এলাকাবাসীদের আবেদন করে গণহত্যার সত্যতা যাচাই করা।

ভৌগোলিক অবস্থান:

বাকেরগঞ্জ একটি বৃহৎ উপজেলা। এই উপজেলা ১৪টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এগুলো হল- চরামদ্দি, চরাদি, দাড়িয়াল, দুধল, দূর্গাপাশা, ফরিদপুর, কবাই, নলুয়া, কলসকাঠী, গারুড়িয়া, ভরপাশা, রঙ্গশ্রী, পাদ্রী শিবপুর ও নিয়ামতি। গারুড়িয়া ও খয়রাবাদ গারুড়িয়া ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দুটি গ্রাম। এই গ্রাম দুটিতে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও স্থানীয় দোসরদের দ্বারা একই দিনে ও একই সময়ে গণহত্যা সংঘঠিত হয়। গারুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বিদ্যালয়ের মাঠেই মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেওয়া হত।

বাকেরগঞ্জ উপজেলার মানচিত্র, বাংলাপিডিয়ার সৌজন্যে

গণহত্যা ও নির্যাতনের পটভূমি:

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পরে বর্তমান বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশে পরিণত হয়। শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকবর্গ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের প্রতি অবহেলা ও বৈষম্য প্রদর্শন করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই এ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ বাঙ্গালীদের ভাষার উপর আঘাত হানে এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য বহু বাঙ্গালী জীবনদান করেন। এভাবে বাঙ্গালীরা তাদের অধিকার আদায়ে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালী ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতন ঘটায়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ০৭ টি মহিলা আসনসহ মোট ১৬৭ টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এর পরই শুরু হয় বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশন হওয়ার কথা থাকলেও ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান এক ঘোষণার মাধ্যমে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২ ও ৩ মার্চ হরতাল পালিত হয়। বরিশাল অঞ্চলেও ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার বিরুদ্ধে জনগণ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। বরিশাল অঞ্চলের রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক সকলেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর বরিশাল অঞ্চলের লোকজন পাকিস্তানিদের বিরূদ্ধে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে থাকে। ঢাকার রাস্তায় সেনাবাহিনী বেড়িয়ে পড়ার খবর বরিশালে নুরুল ইসলাম মঞ্জুর কাছে পৌঁছানো হয়। তৎকালীন বরিশালের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ দেশকে মুক্ত করার জন্য রাত তিনটার দিকে পুলিশ লাইনের ৫০০ রাইফেল নিজেদের হাতে তুলে নেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ (২৬-০৩-১৯৭১) জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবদুল মালেক খানের সভাপতিত্বে জনাব নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকে বেসাময়িক প্রধান এবং মেজর এম.এ. জলিলকে প্রতিরক্ষা প্রধান করে বরিশালে সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধ

পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বরিশালে সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সচিবালয় ছিল বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিক সরকার গঠনের পূর্ব পর্যন্ত এটি অঘোষিত সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বরিশাল স্টেডিয়াম মাঠে হানাদার বাহিনীর এক গুপ্তচরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী বরিশাল শহরে বিমান হামলা করে। ফলে শহরের লোকজন আত্মরক্ষার্থে পালিয়ে গ্রামে আত্মীয় স্বজনদের কাছে চলে যায়। ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী বরিশালে প্রবেশ করে এবং ঐ দিনই বিকেলে গানবোটে বাকেরগঞ্জে প্রবেশ করে। পাকিস্তানি বাহিনীর কামানের শব্দে লোকজন বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে যায়। জেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দের নির্দেশে বাকেরগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধা সহায়তা কমিটি এবং থানা কমিটি গঠিত হয়। এর মাধ্যমে বাকেরগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি বাহিনী গড়ে ওঠে। ক্যাপ্টেন নাসিরউদ্দীনের নেতৃত্বে নাসির বাহিনী রঙ্গশ্রী, ভরপাশা, পাদ্রীশিবপুর ও নিয়ামতি অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়। জনাব পঞ্চম আলীর নেতৃত্বে পঞ্চম আলী বাহিনী দূর্গাপাশা, ফরিদপুর, কবাই এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। আর রফিকুল ইসলাম জাফরের নেতৃত্বে জাফর বাহিনী গারুড়িয়া, কলসকাঠী, চরাদি ও চরামদ্দি এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। এ সকল বাহিনীতে সংশ্লিষ্ট এলাকার ছাত্র, শিক্ষক, যুবক, পুলিশ, সেনাবাহিনী ও ই.পি আর এর সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। জাফরবাহিনী গারুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেয়া হতো। জাফর বাহিনী ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের সাথে যোগাযোগ করে ভারী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনা করে। বাকেরগঞ্জে গঠিত অপর দুই বাহিনীও (নাসির বাহিনী ও পঞ্চম আলী বাহিনী) পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। অন্যদিকে, বাকেরগঞ্জের তৎকালীন মুসলিমলীগের নেতা মজিবর মোল্লার নেতৃত্বে গঠিত পিস কমিটি ও স্থানীয় দোসররা জাফর বাহিনী, নাসির বাহিনী ও পঞ্চম আলী বাহিনীর কর্মতৎপরতাকে পাকিস্তানিদের কানে পৌঁছায়। ফলে পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় দোসরদের সহায়তায় গারুড়িয়া, খয়রাবাদসহ বিভিন্ন স্থানে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে।

গণহত্যার একটি চিত্র

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ:

২৮ মে ১৯৭১, শুক্রবার খুব ভোরে পাকিস্তানি বাহিনী গানবোটে করে বরিশাল থেকে কীর্তনখোলা নদীর মাধ্যমে পান্ডব (পান্ডো) নদীতে প্রবেশ করে সুখী নীলগঞ্জ ঘাটে পৌঁছে। মুহূর্তের মধ্যে খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গাভীখোলা গ্রামের আবদুল হক সিকদার গারুড়িয়া গ্রামে এসে মিলিটারী আগমণের খবর দিয়ে সকলকে সতর্ক করেন। এই খবর শুনে গারুড়িয়া গ্রামের লোকজন বনে-জঙ্গলে যে-যার মত পেরেছে দৌঁড়ে পালিয়েছে। এরই মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় দোসর লতিফ দফাদার, সেকান্দার ঢালী, আজিজ মোল্লা

এদের সহযোগিতায় গারুড়িয়া গ্রামে প্রবেশ করে। সেকান্দার ঢালী ছিলেন পাকিস্তানি বাহিনীর পথ প্রদর্শক। পাকিস্তানি বাহিনী প্রথমেই গারুড়িয়া খুঁজতে থাকে। মহিলাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং তাদের ভয় দেখায় পুরুষদের না পেলে তাদেরকে গুলি করা হবে। শেষ পর্যন্ত পুরুষদের না পেয়ে চৌকিদার বাড়ির সব ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ঘর সম্পূর্ণ না পোড়া পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনী সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের পাশে গোয়াল ঘরে থাকা গরুগুলোও আগুনে পুড়ে মারা যায়। এরপর পাকিস্তানি বাহিনী সেখান থেকে চলে গিয়ে ঘোষাল বাড়িতে প্রবেশ করে। ঘোষাল বাড়ির শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী যিনি মন্দিরে প্রণামরত অবস্থায় ছিলেন তাঁকে পাকিস্তানি বাহিনী পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করে। গাঙ্গুলী বাড়ির মতিলাল গাঙ্গুলী পালানোর সময় পাকিস্তানিদের চোখে পড়ে এবং তাঁকেও পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এরপর পাকিস্তানি বাহিনী গারুড়িয়া বাজারে প্রবেশ করে সব দোকানগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুহূর্তেই সবকিছু ভষ্মিভূত হয়ে যায়। বিদ্যানন্দ হালদার বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি ছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী বিদ্যানন্দ হালদারকেও গুলি করে হত্যা করে এবং তার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। গারুড়িয়া গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই স্থানীয় দোসরদের সহায়তায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এভাবে গারুড়িয়া গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের তিনজনকে হত্যা ও প্রায় সকল ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চলে যায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চলে গেলে শহীদ পরিবারের সদস্যদের তাঁদের নিজ নিজ বাড়িতে সমাধিস্থ করা হয়। অন্যদিকে, একই তারিখ এবং একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৮ মে শুক্রবার, খুব ভোরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অন্য একটি দল বরিশাল থেকে কীর্তনখোলা নদীর মাধ্যমে লঞ্চযোগে খয়রাবাদে পৌঁছে। খয়রাবাদে পিচ কমিটির নেতা মজিবর মোল্লার সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই গ্রামে প্রবেশ করে। পাকিস্তানি বাহিনীর আগমণের খবরে যে-যার মত পালানোর চেষ্টা করে। প্রথমেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী খয়রাবাদের জমিদার মানিক চক্রবর্তীর বাড়িতে আক্রমণ করে। কিন্তু মানিক চক্রবর্তী পার্শ্ববর্তী বাড়িতে পালিয়েছিলেন। স্থানীয় রাজাকার সোবাহান কাজী চৌকিদার মানিক চক্রবর্তীকে দেখেছিলেন। মানিক চক্রবর্তী সোবাহান কাজী চৌকিদারকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তাঁকে (শহীদ মানিক চক্রবর্তী) তুলে না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তা না শুনে সোবাহান কাজী মানিক চক্রবর্তীকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দেন। মানিক চক্রবর্তী ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে (ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘঠিত যুদ্ধ) পাকিস্তান সরকারকে যে চাঁদা দিয়েছিলেন তার রশিদ পাকিস্তান বাহিনীকে দেখিয়েছিলেন। এতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী প্রথমে তাঁকে ছেড়ে দেয় কিন্তু স্থানীয় দোসরদের কু-প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মানিক চক্রবর্তীকে গুলি করে হত্যা করে। মানিক চক্রবর্তীর ভাগ্নে সাগর ব্যানার্জী বরিশাল থেকে পালিয়ে খয়রাবাদে মামা মানিক চক্রবর্তীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। খয়রাবাদে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আগমণের খবর শুনে সাগর ব্যানার্জী মামা মানিক চক্রবর্তীর বাড়ি থেকেও পালিয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয় রাজাকার নজর আলী খাঁ ও গনি খাঁ সাগর ব্যানার্জীকেও ধরে ফেলে। তারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছে সাগর ব্যানার্জীকে মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচয় করিয়ে দেয়। ফলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সাগরকে গুলি করে হত্যা করে। স্থানীয় দোসরদের কু-প্ররোচনায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মানিক চক্রবর্তীর বডিগার্ড মোহম্মদ হাওলাদারকে নারিকেল গাছে থাকা অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। এরপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী খয়রাবাদ গ্রামের অন্যান্য বাড়িতে আক্রমণ করে। স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় হানাদার বাহিনী হরকুমার ধোপা, সীতানাথ পালকে তাদের বাড়িতে গুলি করে হত্যা করে। এরপর হানাদার বাহিনী জেলে পাড়ায় আক্রমণ করে নারায়ণ চন্দ্র দাস ও রামকান্ত দাসকে গুলি করে হত্যা করে। এ সময় বালিগ্রামের রামেশ্বর মিস্ত্রীকেও গুলি করে হত্যা করা হয়। কিন্তু গুলি পেছন

দিক থেকে গালে লেগে তা বেরিয়ে যায়। এর কয়েক ঘন্টা পর তিনিও মারা যান। এভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী খয়রাবাদে ৮ জন লোককে হত্যা করে। গ্রামের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় দোসর ও লুটেরাদের দল এসব বাড়ি থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চলে গেলে শহীদ মানিক চক্রবর্তী ও তাঁর ভাগ্নে শহীদ সাগরকে স্থানীয় লোকজন একই জায়গায় সমাধিস্থ করেন। অন্যান্য শহীদদেরও নিজ নিজ বাড়িতে তাঁদের আত্মীয় স্বজনরা সমাধিস্থ করেন। খয়রাবাদ হত্যাযজ্ঞের পর খয়রাবাদের অধিকাংশ শহীদ পরিবার ও তাঁদের আত্মীয় স্বজনরা দেশ ত্যাগ করেন।

শহীদদের তালিকা:

ক্র. নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	বয়স (বছর)	পেশা
১	শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী	কালিপ্রসন্ন চক্রবর্তী	দেউলি, গারুড়িয়া	৭৫	পুরোহিত
২	মতিলাল গাঙ্গুলী	সারদাচরণ গাঙ্গুলী	গারুড়িয়া	৬০	কৃষি
৩	বিদ্যানন্দ হালদার	নবীন চন্দ্র হালদার	গারুড়িয়া	৭০	কৃষি
৪	মানিক চক্রবর্তী	উপেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী	খয়রাবাদ	৫০	জমিদার
৫	সাগর ব্যানার্জী	রমনীকান্ত ব্যানার্জী	খয়রাবাদ	২৫	ছাত্র
৬	হরকুমার ধোপা	-	খয়রাবাদ	৭০	কর্মকার
৭	নারায়ণ চন্দ্র দাস	শ্যামাচরণ দাস	খয়রাবাদ	৬০	জেলে
৮	রামকান্ত দাস	নকুল চন্দ্র দাস	খয়রাবাদ	২০	জেলে
৯	সীতানাথ পাল	রাধামোহন পাল	খয়রাবাদ	৭৫	কুমার
১০	মোহম্মদ হাওলাদার	আজাহার হাওলাদার	খয়রাবাদ	৫০	কৃষি
১১	রামেশ্বর মিস্ত্রী	কালু মিস্ত্রী	বালিগ্রাম	৫৫	কাঠমিস্ত্রী

গণহত্যায় প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার:

নিত্যরঞ্জন ঘোষাল (৬৫)

পিতা: বিনোদ বিহারী ঘোষাল, গ্রাম: গারুড়িয়া, ডাকঘর: গারুড়িয়া, উপজেলা: বাকেরগঞ্জ, জেলা: বরিশাল।
সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮, নিজ বাসভবন।

আমি মিস্টার নিত্যরঞ্জন ঘোষাল প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, গারুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আমি গারুড়িয়া ইউনিয়নে সংগঠিত জাফর বাহিনীর একজন সদস্য। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় গারুড়িয়া গ্রামে এবং খয়রাবাদ গ্রামে একই দিনে আর্মি এসে আক্রমণ করে। প্রথমে গানবোট নিয়ে নীলগঞ্জ স্টেশনে এসে স্টপেজ দেয়। একদম শেষ রাতে আযানের আগে পায়ে হেঁটে গারুড়িয়ার দিকে আর্মি যখন যাচ্ছিল তখন ফজরের নামাজ পড়তে ওঠা দু-একজন লোক আর্মি আসার বিষয়টি অবগত হয় এবং তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে বুঝতে পারে যে গারুড়িয়া গ্রামের দিকে যাচ্ছে। তারা (ফজরের নামাজ পড়তে ওঠা দু-একজন লোক) দ্রুত অন্যপথে গারুড়িয়া গ্রামে খবরাখবর করে। এর ফলে যারা খবর সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে, তারা পালিয়েছে। গ্রামের বাসিন্দারা অধিকাংশই হিন্দু। তারা আর্মি আসবে আসবে খবরে উদ্বিগ্ন ছিল। তারা আগে থেকে বিভিন্ন আশ্রয়স্থলে আশ্রয় নিয়েছিল। যারা শেষ পর্যন্ত ঐ দিন উপস্থিত ছিল তারা তাৎক্ষণিকভাবে খবর পেয়ে বনে-জঙ্গলে, খালে-বিলে, এখানে-সেখানে লুকিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে। অশীতিপর বৃদ্ধ তিন ব্যক্তি আর্মির কবলে পড়ে। তারা পালিয়ে যেতে পারেনি। এর ভিতরে আমাদের বাড়ির আমার এক আত্মীয় আমার দাদু সম্পর্ক শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন আমাদের বাড়িতে। তিনি অত্যন্ত বয়স্ক লোক ছিলেন

আর ধর্মপ্রাণ লোক। তাকে যখন বলা হয় যে, আর্মি আসতেছে, আপনি ঘর থেকে সরে যান, পিছনে বাগানের দিকে যান তখন সে ঠাকুরমন্দিরে নমস্কার করে যাবে এই মুহূর্তে নমস্কাররত অবস্থায় তাকে পিছন থেকে আর্মি এসে গুলি করে এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। আমাদের বাড়ির পুকুরের দক্ষিণ পাশ দিয়ে মতিলাল গাঙ্গুলী ধান ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিলেন নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কিন্তু তাঁকেও আর্মি এসে পিছন দিক থেকে গুলি করে মেরে ফেলে। বিদ্যানন্দ হালদারও তাঁর বাড়িতে বৃদ্ধ অবস্থায় ছিল। সেও আর সরতে পারেনি। তাঁকেও আর্মি ওখানে মেরে ফেলে। এভাবে গারুড়িয়া গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে হানা দেয়। কিন্তু লোকজন না পেয়ে অনেক বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। আর অগ্নিসংযোগ করে চলে যায়। লোকজন না পেয়ে এরপর এদের পিছনে তাদের দোসর, রাজাকার, লুটেরা এরা লুটপাট শুরু করে এবং সমগ্র গ্রামটিই তছনছ করে দেয় লুটপাট করে। আর্মিদের সহযোগী হিসেবে গারুড়িয়া ইউনিয়নের দীর্ঘদিনের চেয়ারম্যান এবং একসময়কার পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ছিলেন মজিবর রহমান মোল্লা। তিনি শান্তি কমিটির জেলা পর্যায়ের নেতা ছিলেন। তার (মজিবর রহমান মোল্লা) নির্দেশে, তার পরামর্শেই আর্মি মুভ করেছে এটা শুনেছি। সেকান্দার ঢালী নামে এক লোক ছিল তাদের (আর্মিদের) পথ প্রদর্শক হিসেবে। গারুড়িয়া কোন খান থেকে কোন দিকে যাবে সেকান্দার ঢালী নামে ঢালী বাড়ির এক লোক যার বাড়ি খুব সম্ভবত জিনিয়া অথবা বালিগ্রাম সেই ছিল পথ-প্রদর্শক। প্রায় সব বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে চলে যায়। অগ্নিসংযোগে অত ভোরে শিশির ভেজা অবস্থায় তেমন একটা আগুনে পোড়েনি। খড়ের ঘর দুএকটা পুড়েছে। আর টিনের ঘর যেগুলো ছিল সেগুলো লুটেরাদের দল লুটপাট করে নিয়ে যায় এবং গ্রামটি ছাড়খার করে দিয়ে যায়। গারুড়িয়ায় খ্যাতনামা মুক্তিবাহিনী ছিল। নাম ছিল জাফরবাহিনী। সেই বাহিনীর সদস্য আমরা। কিন্তু ঐ সময়ে ঐ বাহিনীর (মুক্তিবাহিনী) লোকজন এই এলাকায় ছিল না। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। পরবর্তীতে এসে আর্মির নাগাল পায়নি। কিছু করতে পারেনি। পরিকল্পনা আগে থেকে জানা থাকলে মুক্তিযোদ্ধারা সেভাবে প্রস্তুতি নিতে পারতো। আমি তখন পাশ্ববর্তী গ্রাম দেউলিতে ছিলাম। দেউলি ছিল গারুড়িয়া খয়রাবাদের মাঝামাঝি গ্রাম। দেউলিতে আমি ছিলাম সংগঠনের কাজে। আর্মি চলে যাওয়ার পরে আমরা যখন বিকেলের দিকে গ্রামে ফিরে আসি তারপরে এই লাশ মুখাগ্নি করে মাটি চাপা দেয়া হয়। এইভাবে এদের (শহীদদের) শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মুক্তিযোদ্ধারা যখন বাকেরগঞ্জ থানা আক্রমণ করেছিল তখন বাকেরগঞ্জ থানায় যারা রাজাকার ছিল তাদের অনেককেই মুক্তিযোদ্ধারা শিবপুর ক্যাম্পে শাস্তি দিয়েছিল। কাউকে মেরে ফেলাও হয়েছে। পরবর্তীতে যখন সরকার গঠিত হয় তখন তো মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে কিছু ছিল না। আইনানুগভাবে যারা বিচারের সম্মুখীন হবে তাদের বিচার হবে। সে (মজিবর রহমান মোল্লা) যেনতেনভাবে বিচারের আওতায় আসে নাই। সেভাবে সে শাস্তি পায়নি। এভাবে অনেকেই আছে যারা আইনের ফাঁকফোকড় দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

নগেন্দ্রনাথ হালদার (৮০)

পিতা: শহীদ বিদ্যানন্দ হালদার, গ্রাম: গারুড়িয়া, ডাকঘর: গারুড়িয়া, উপজেলা: বাকেরগঞ্জ, জেলা: বরিশাল। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮, নিজ বাসভবন।

আমার নাম নগেন্দ্রনাথ হালদার। আমার বাবার নাম বিদ্যানন্দ হালদার। বাবা তখন বাড়ি ছিলেন। মিলিটারী গারুড়িয়া আসছে এবং গারুড়িয়া বাজার পুড়িয়ে একদল আমাদের এদিকে আসছে। এরা গেছে ইসমাইল শিকদারের বাড়ি। তাঁকে (ইসমাইল শিকদার) ধরে নিয়ে গানবোটে করে নীলগঞ্জ নিয়ে গেছে। আরেকদল আগুন দেওয়ার পর গারুড়িয়ার মতি গাঙ্গুলী, শরৎঠাকুর (তিনি ছিলেন নারায়ণ ঘোষালের শ্বশুর) এদের মেরে মিলিটারী এদিকে আসছে। বাবা ছিলেন উত্তর দিকে। মুসলমানরা কইছে হালদার মশায় আপনি

যাইয়েন না বাড়িতে। কয় আমি (বিদ্যানন্দ হালদার) বুড়া মানুষ। যাই, বাড়ির মায়া। শেষে বাড়ির পুকুরের উত্তর কর্ণারে একটু ঝোপঝাড় ছিল ঐখানে যাইয়া পলাতক অবস্থায় ছিল। যারা দেখতে আইছে মুসলমানরা তারা বলছে। আমরা তো আর বাড়ি থাকতে পারি নাই। আমরা দূরে যাইয়া পলাইয়া রইছি। আমরা বাড়ি থাকলে আমাগো রাখতে? আমাগো মাইরা থুইয়া যাইতে। শেষে বাবারে (শহীদ বিদ্যানন্দ হালদার) গুলি দিয়া এইখানে ফালাইয়া থুইয়া গেছে। আমার বুড়া বাবাকে। আমরা আইছি বাড়ি। বাড়ি আইছি পর কতিপয় লোক যারা ছিল তারা আমাকে ধরে এনে আচি ভরে জল এনে মাথায় জল দেয়। বাড়িতে বেমালা (অনেক) লোক আইছে দেখতে। স্থানীয় লোকজন মিলিটারী আসতে সাহায্য করেছিল। এরা (মিলিটারীরা) তো এর মধ্যে চেনে না। তারা (স্থানীয় দোসর) মিলিটারীদের লগে আইছে। ঘরে আগুন দিয়েছে। ঘরে এক কর্ণার দিয়ে আগুন দিয়েছে এবং এই পর্যন্ত পুড়ে গেছে।

স্বপন গাঙ্গুলী (৬৫)

পিতা: শহীদ মতিলাল গাঙ্গুলী, গ্রাম: গারুড়িয়া, ডাকঘর: গারুড়িয়া, উপজেলা: বাকেরগঞ্জ, জেলা: বরিশাল। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, নিজ বাসভবন ।

আমি স্বপন গাঙ্গুলী। বাবা মতিলাল গাঙ্গুলী। ১৯৭১ সালে ওনারে (শহীদ মতিলাল গাঙ্গুলী) বাড়ি থেকে ধরে নেয়া হয়েছিল। আমার বাড়িঘর লুট করে নিয়ে গেছে লুটেরাদের দল। ১৯৭১ সালে আমরা পাশের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেই জায়গা থেকে ধরে নিয়া বাবাকে (শহীদ মতিলাল গাঙ্গুলী) গুলি কইরা মারছে। ঘোষালবাড়ির পুকুরপাড় থেকে এখানে এনে প্রাইমেরী স্কুলের পাশে বাবাকে মাটি দিয়েছি। আমার ঠাকুরদা, ঠাকুরমার শ্মশানের পাশে। আমি তখন গারুড়িয়া স্কুলের ছাত্র ছিলাম। স্কুলে পড়াশুনা করছিলাম, দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। মিলিটারী প্রথম আসছে নীলগঞ্জ থেকে গানবোট করে ঘোষাল বাড়ির রাস্তা দিয়ে। ওখান দিয়ে ওনাকে (শহীদ মতিলাল গাঙ্গুলী) ধরে নিয়েছে। আর বিদ্যানন্দ হালদার, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী নামে এইখানে একজন ব্রাহ্মণ থাকত। এই তিনজন লোককেই হত্যা করেছে। তাঁর (শহীদ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী) স্মৃতির জন্য ওখানে মাটি দেওয়া আছে, শশ্মানটিও আছে। বিদ্যানন্দ হালদারের শ্মশান তাঁর বাড়িতেই আছে। আমি তখন বাড়ির পাশেই পালিয়ে ছিলাম। সেখান থেকেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। মিলিটারীরা সরাসরি বাবাকে (শহীদ মতিলাল গাঙ্গুলী) পিছন দিক থেকে গুলি দিয়েছে। স্থানীয় লতিফ দফাদার, সেকেন্দার ঢালী যার বাড়ি জিনিয়া কাঠীপাড়া এ রকম অনেক লোকই মিলিটারীদের সাথে ছিল। তখন তো এত লক্ষ্য করা সম্ভব ছিলনা। এরপর বাজারে গিয়ে আগুন দিছে। বাজার পুড়ে ফেলছে। গারুড়িয়ায় মোট ৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে। মিলিটারী যাওয়ার পরে আমি নিজে এসে তাকে (শহীদ মতিলাল গাঙ্গুলী) মাটি দিয়ে রাখছি। আর কিছু করতে পারিনি। লোকজন ভয়তে গ্রাম ছাড়া। যার যার বাড়ির সামনেই তাকে গুলি করেছে। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ছিল ঐ বাড়িতে তাকে সেখানেই গুলি করেছে। আর আমার বাবা (শহীদ মতিলাল গাঙ্গুলী) এখান থেকে পালাইতে শুরু করেছে তাকে ধরে নিয়ে গুলি দিছে। আমার বাবার বয়স তখন ৬০ বা তার উপরে। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী বয়স এরকম বা তারও উর্ধ্বে হবে। বিদ্যানন্দ হালদারের ও একই বয়স। তারা (মিলিটারীরা) নির্যাতন করেনি। তবে, তাদের লগে যারা ছিল তারা লুটপাট চালাইছে। মিলিটারী আসার আগেও লুটপাট চালাইছে। আমার ঘর লুট করে নিয়েছে। গারুড়িয়া রব চৌধুরী, কমল ব্যানার্জী, জাফর সিকদার এরকম অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিল। গারুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ছিল। ওখানে ট্রেনিং দেয়া হতো। আমরাও ওখানে ট্রেনিং দিছি। আমরা জাতিগতভাবে হিন্দু এ করণেই বেছে বেছে হিন্দুদেরই হত্যা করা হয়েছে। স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই এদের (মিলিটারীদের) পক্ষে ছিল। বাবার স্মৃতি রক্ষার্থে ওখানে একটি কোন রকমে সৌধ বানাইয়া রাখছি। রোজই সেখানে মোমবাতি জ্বালাই। গণহত্যা

দিবসে যে মোম জ্বালাই তা না আমি ওখানে প্রতিদিনই মোম জ্বালাই। আমাকে কেউ খোঁজও করে নাই। কেউ ডেকেও জিগায় নাই। জাফর (মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম জাফর) মরার পর আমাকে তালাশ করা হয় নাই। যত কাগজপত্র, মুক্তিবাহিনীর সার্টিফিকেট সব তাঁর (রফিকুল ইসলাম জাফর) কাছেই ছিল। মরার পর আর কিছুই পাই নাই। শরৎ ঠাকুর ও বিদ্যানন্দ হালদারকে যে মাইরা রাখছে তা আমি দেখছি। তখন আমি আমাকে নিয়ে ব্যাস্ত। দেশ ছাড়া মানুষ, কাউকেই পাইনি। অন্যধরনের নির্যাতনের মধ্যে আমি বাড়ি থাকতে পারতাম না। আমার বোনটারে নিয়ে এদিক ওদিক থাকতাম। মাকে সন্ত¦না দেয়ার মত কেউ ছিল না। কোথায় কোথায় রইছি, ভিক্ষাও করছি নিজে বাঁচার জন্য এবং এখনও করতেছি।

সুনীল সরকেল (৬৩)

পিতা: নারায়ণ চন্দ্র সরকেল, গ্রামঃ খয়রাবাদ, ডাকঘর: খয়রাবাদ, উপজেলা: বাকেরগঞ্জ, জেলা: বরিশাল। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ১৯ অক্টোবর ২০১৮, নিজ বাসভবন।

আমার নাম সুনীল কুমার সরকেল, বাবার নাম নারায়ণ চন্দ্র সরকেল, গ্রামঃ খয়রাবাদ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমার আনুমানিক বয়স ছিল ১৩ বা ১৪ বছর। ঐ সময় খয়রাবাদে শুক্রবার দিন অনুমান রাত ৪ টার দিকে একটি গানবোটে একতলা লঞ্চে আমাদের এলাকার কিছু দালালের সহযোগিতায় আর্মি আসে এবং চরসমসদি ভাড়ানী হতে ইঞ্জিন বন্ধ করে গুণ টেনে আসে। লঞ্চের সুকানী খুব ভাল লোক ছিল। উনি ব্যাগার করছে লঞ্চ স্টেশনে এসে মানিক বাবুর দরজায় ভিড়ানোর জন্য। ব্যাগারের শব্দে এলাকার লোকজন সতর্ক হয়ে আশেপাশে পালাইছে। মানিক বাবু তখন বাড়িতে ছিল। গানবোট দিয়ে আর্মীরা উঠে মানিক বাবুর দালানের চিলাকোঠায় গুলি করছে। মানিক বাবু ঐ ঘর থেকে লাফিয়ে পড়ে চৌধুরী বাড়ি নামে একটি জায়গা আছে সেখানে তাঁর বিশ্বস্ত লোক ছিল মোসলেম হাওলাদার নাম, ঐ বাড়ির সুপারির ডাবের একটা মাঁচা ছিল সেই মাঁচার উপরে একটি ডোলার মধ্যে ছিলেন। আর্মি টার্গেট করে সেই বাড়িতে যায় এবং সেই ঘরেও ওঠে। মানিক বাবু তখন চিন্তা করছে এই জায়গায় মহিলারা হয়ত প্রেসার ক্রিয়েট করলে বইল্যা দিবে। আর্মি যখন ঐ বাড়ি থেকে চেক করে বের হয়ে আসে তখন উনি (শহীদ মানিক চক্রবর্তী) মনে বল রাখতে পারে নাই। তখন চৌধুরী বাড়ি থেকে নেমে সোজা সরকেল বাড়ির বাগানের দিকে রওনা করছে কোলার মধ্য দিয়ে লাফিয়ে। তখন আর্মি তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করছে। সেই গুলি ডান হাতের কব্জায় পরে। রক্তাক্ত অবস্থায় যখন সরকেল বাড়ির দিকে দৌঁড়ে যাচ্ছে তখন ওখানে অনেক কাঁটাবহরির জঙ্গল ছিল যেখানে গিয়ে আশ্রয় নিবে। তখন সোবাহান কাজী ঐ রাস্তায় দাঁড়ানো ছিল সরকেল বাড়ির পশ্চিম দিকের রাস্তায়। উনি (শহীদ মানিক চক্রবর্তী) বলছিল সোবাহান তুই আমাকে দেখাইয়া দিস না । তোর জীবনে আর কামাই করে খাইতে হবে না। আমি যা দিমু তা দিয়ে তুই সারা জীবন বসে খাইতে পারবি কিন্তু সোবাহান কাজী রাস্তায় থাকাতে উনি (শহীদ মানিক চক্রবর্তী) সরকেল বাড়ির বাগানের ভিতর ঢুকে কেওয়া ঝোঁপের মধ্যে পালাইছে। তাকে (সোবাহান কাজী) প্রেসার দেওয়ায় সোবাহান কাজী বইল্যা দিছে। ঐ খান দিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে (শহীদ মানিক চক্রবর্তী) আর্মিতে ধরে বাড়ি নিয়ে আসে। বাড়িতে আনার পর ৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এই দেশে যে চাঁদা ধরেছিল, উনি (শহীদ মানিক চক্রবর্তী) কিছু চাঁদা দেছে এবং সেই কাগজপত্র ডকুমেন্ট ওনার(শহীদ মানিক চক্রবর্তী) কাছে ছিল। উনি (শহীদ মানিক চক্রবর্তী) সেই কাগজপত্র গানবোটের মেজরকে দেখানোর পর মেজর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে (শহীদ মানিক চক্রবর্তী) ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দেওয়ার পর সে বাড়ির ভিতর আসছে। পরে যারা আর্মি আনার পক্ষে ছিল সেই দালাররা মেজরকে অনেক বুঝানোর পরে মেজর সাইবে তাঁকে ধরে নদীর পারে গুলি দিয়ে মেরে ফেলেছে। ঐ দিন মানিক বাবুর বাড়ির উত্তর পাশে ধোপা বাড়ী ছিল, সেই হরকুমার ধোপাকে মারছে এবং জাইল্যা (জেলে) বাড়ির অনেক লোকজন বিছরাইয়া

বিছরাইয়া (খুঁজে খুঁজে) মারছে। তারপরে নারায়ণ চন্দ্র দাস, হরকুমার ধোপি, রামকান্ত, সিতানাথ, রামেশ্ব^র মিস্ত্রী, মোহম্মদ হাওলাদার, সাগর এদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সাগরের বাড়ি বরিশালে। উনি (শহীদ সাগর) মানিক বাবুর আত্মীয়। ভাল ছেলে। উনি (শহীদ সাগর) মানিক বাবুর বাড়ি পলাতে এসেছিলেন। তখন এমএ তে পড়ে চিটাগং ভার্সিটিতে। উনি (শহীদ সাগর) পলাইতে গেছে। খয়রাবাদ ব্রিজের উপর দিয়ে কিছু দুস্কৃতিকারী তাঁকে (শহীদ সাগর) রড দিয়ে বারি দিয়ে তাঁকে আহত করে ধরে রেখে এবং ইউনিয়ন পরিষদের পোষ্ট অফিসের ভিতর রাখছে। পরে তাঁকে এনে আর্মির হাতে দিছে এবং আর্মি তাঁকে গুলি দিছে। আমি এই পর্যন্ত জানি। এ পর্যন্ত আমার বক্তব্য প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে। মানিক বাবু ও সাগরের কবর তাঁর বাড়ির সামনে রাস্তার পাশে কবর দেয়া হইছে। অন্য লোকদের তাদের নিজ নিজ বাড়িতে কবর দেয়া হইছে।

সমীর কুমার সেন (৬৬)

পিতা: মৃত অশ্বিনী কুমার সেন, গ্রামঃ খয়রাবাদ, ডাকঘর: খয়রাবাদ, উপজেলা: বাকেরগঞ্জ, জেলা: বরিশাল। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ১৯ অক্টোবর ২০১৮, নিজ বাসভবন ।

আমি সমীর কুমার সেন, বাড়ি খয়রাবাদ আমার বয়স তখন ১৫ বছর। প্রত্যক্ষদর্শী বলতে, আমি পরে যাইয়া দেখছি। মিলিটারী যখন আসছে তখন তো কাছে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পরে গিয়ে দেখলাম মানিক চক্রবর্তীকে মাইরা থুইছে নদীর চরে, হরকুমার ধোপাকে মাইরা ফালাইছে, মোহম্মদ হাওলাদারকে মাইরা ফালাইছে। সাগরের কথা শুনছি আটকাইয়া থুইছে, মারবে এই প্লান চলতেছে। নারায়ণ চন্দ্র দাস, রামকান্ত দাস, সীতানাথ পাল, রামেশ্বর মিস্ত্রী, মোহম্মদ হাওলাদার এদেরকে মাইরা ফালাইছে। আমরা যেয়ে দেখছি এদের মিলিটারীরা মারছে। স্থানীয় লোকেরা এদের সহায়তা করছিল। আতাহার তালুকদার, মজিদ মাস্টার, মজিদ মাস্টার তো ভাল লোক ছিল কিন্তু তাদেরকে কন্ট্রোল করতে পারেনি নজর খাঁ , গনি খাঁ, আতাহার তালুকদার, কেরামত ঢালী মিলিটারীদের আনছে। অন্য লোক এদের (শহীদদের) কবর দিয়েছে। যারা মারছে, যাদের সহায়তায় হয়েছে তারা কবর দেয়নি। মানিক চক্রবর্তী দৌঁড় দিয়েছিল কিন্তু সোবাহান কাজী ধইরা ফালাইছে। সোবাহান কাজীকে অফারও দিয়েছিল তোকে অনেক কিছু দেব। তুই আমাকে মারিসনা। আমাকে জানটা ভিক্ষা দিয়া যা। আমাদের বাড়িঘর ৩/৪ বার করে লুট হয়েছে। গরু আছিল, ধান,চাল নিয়ে গেছে। এইখানের বিশ্বাস বাড়ির কেরামত আলী বিশ্বাস, হাফেজ চৌকিদার যিনি বিশিষ্ট সন্ত্রাসী না অঘটন করছে এমন কোন কাজ নেই। অনেক মা বোনের ইজ্জত তারা নিয়েছে। যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাঁদের সবার বাড়িই কাছাকাছি ছিল। সোবাহান কাজী, আতাহার তালুকদার, মজিবর মোল্লা এরাই মিলিটারীদের সব জায়গায় নিয়ে গেছে। এরাই ক্ষতি করছে।

দিলীপ কুমার রায় (৫৬)

পিতা: মৃত বিলাস চন্দ্র রায়, গ্রামঃ খয়রাবাদ, ডাকঘর: খয়রাবাদ, উপজেলা: বাকেরগঞ্জ, জেলা: বরিশাল। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান: ১৯ অক্টোবর ২০১৮, নিজ বাসভবন ।

আমার নাম দিলীপ কুমার রায় বাবু। বাড়ি খয়রাবাদ। আমি ঐ সময় যেটা দেখছি সেটা বলি। আমাদের দেশে লুটতরাজ হইছে, হত্যা হইছে, মানিক চক্রবর্তী নামে একজন ছিল তাঁকে হত্যা করেছে। যে সব লোকে করছে আমরা শুনেছি। আমরা তো আর লগে (সাথে) ছিলাম না। আমরা শুনছি অমুকে অমুকে তাঁকে (শহীদ মানিক চক্রবর্তী) হত্যা করছে। সেই লোকগুলোর নাম হইছে আতাহার তালুকদার, মজিবর মোল্লা। তারপর আরও লোকগুলোর নাম আমার মনে নেই। যাই হোক অনেকজন ছিল। আমার তখন বয়স ১২-১৩ বছর। আমি মৃত ব্যক্তিগো দেখতে গেছি পরে। যখন পাঞ্জাবীরা চলে গেছে তখন যাইয়া দেখি ৫/৭ জন লোক বা ৮

জন লোক। তাঁর মধ্যে হিন্দু ছিল রাজেশ্বর মিস্ত্রী (রামেশ্বর মিস্ত্রী), জাইল্যা(জেলে) বাড়ির একজন, মানিক চক্রবর্তী তো ছিলই। হরকুমার ধোপা, নারায়ণ চন্দ্র দাস, রামকান্ত দাস, সীতানাথ, রাজেশ্বর মিস্ত্রী (রামেশ্বর মিস্ত্রী), মোহম্মদ হাওলাদার, সাগর এই সমস্ত লোক আমরা দেখছি যাইয়া। হত্যা করেছিল পাকিস্তানী বাহিনীরা কিন্তু আমাদের দেশী লোক রাজাকার, তারা সহযোগিতা করছে। তাদেরকে আনছে তারা ডেকে এইখানে যেতে হবে, ঐ খানে যেতে হবে, এই লোক মারতে হবে। পাঞ্জাবীরাতো আমাদের দেশ চেনে না কিন্তু আমরাই (স্থানীয় দোসর) পরিচয় দিয়ে দিছি যে এই এই লোক মারতে হবে। কবর তো, সঠিক কিছু আমি জানি না। তবে মানিক চক্রবর্তীর কবর যেখানে করছে সেটা আমি জানি। এক মঠের পাশে তাঁর (শহীদ মানিক চক্রবর্তী) উপর কোন মঠ হয়নি, মাটি দিয়া থুইছে। মৃত ব্যক্তিকে পোড়েও নাই। অন্যান্যদের যার যার বাড়ি লইয়া গেছে। ৭/৮ জন লোক মৃত দেখছি রাস্তায় যাইয়া। তারপর তো যার যার লাশ তাঁর আত্মীয় স্বজনরা লইয়া গেছে। আমাদের গ্রামে লুট হয়েছে ৩/4 বার। ঘর দুয়ার ভেঙ্গে গরু বাঁছুর সব লইয়া গেছে। সরকেল বাড়ি সুনীল সরকেলের বাড়িতে আগুন দিছে। আমাগো বাড়ি দেয়নি। জাইল্যা (জেলে) পাড়ার সব ঘরে আগুন দিছে। দত্ত বাড়ি আগুন দিছে। এইসব জিনিস আমরা দেখছি। তখন আমি বাড়ি ছিলাম। আমাদের আত্মীয় স্বজন সব আমাদের বাড়ি আশ্রয় নিছিল। আমরা অন্য মুসলমান বাড়ি ডাকুয়াবাড়ি ওখানে ছিলাম। সন্ধ্যার পর দত্তবাড়ি দোতলা ঘর ছিল ওখানে মহিলারা ছিল। আমরা বাইরে রাস্তাঘাটে জঙ্গলে ছিলাম। সকাল হইলে জঙ্গলে থাকতাম, সন্ধ্যার আগে বের হতাম।

গণহত্যার বদ্ধভূমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ:

গারুড়িয়া ও খয়রাবাদ গণহত্যায় শহীদদের স্মরণে কোন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে শহীদ পরিবারের লোকজন শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন। শহীদ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, শহীদ মতিলাল গাঙ্গুলী, শহীদ বিদ্যানন্দ হালদার এর স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁদের সন্তানরা এবং আত্মীয়-স্বজন নিজেদের উদ্যোগে পাঁকা শ্মশান নির্মাণ করেন। খয়রাবাদে শহীদ মানিক চক্রবর্তী এবং তাঁর ভাগ্নে শহীদ সাগরকে একই স্থানে সমাধিস্থ করা শ্মশানটি বর্তমানে মাটির সাথে মিশে গেছে এবং স্থানটি ঝোঁপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এছাড়া খয়রাবাদ হত্যাযজ্ঞে আরও যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের আত্মীয়- স্বজন নিজ নিজ উদ্যোগে শহীদদের সমাধিস্থ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তা অরক্ষিত। স্বাধীনতা এত বছর পরেও শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন উদ্যোগ তো নেয়া হয়নি, এমনকি গণহত্যা দিবসে শহীদদের স্মরণ করাও হয়না ।

উপসংহার: মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। তবে ১৯৭১ সালের ২৮ মে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাকেরগঞ্জের গারুড়িয়া ও খয়রাবাদ হত্যাযজ্ঞ ছিল পূর্বপরিকল্পিত। এই দুটি গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হিন্দু সম্প্রদায়ের ১০ জন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ০১ জনসহ মোট ১১ জনকে হত্যা করে। যদি স্থানীয় লোকজন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আগমনের খবর না জানত তাহলে শহীদদের সংখ্যা আরও বেড়ে যেত। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। আর এই ধর্মীয় কারণে হিন্দু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্যই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হিন্দুদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। গারুড়িয়া ও খয়রাবাদ গণহত্যায় যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন তাঁদের আর্তনাদ বাহির থেকে হয়ত আমরা এখন আর শুনতে পাই না কিন্তু তাঁদের ভিতরে ভিতরে এখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। গণহত্যার পর ক্ষতিগ্রস্ত শহীদ পরিবারের অনেক সদস্যই দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর দু'একটি শহীদ পরিবার ভারত থেকে ফিরে আসলেও তারা শুধু ভিটে-মাটি ছাড়া কিছুই পায়নি। অনাহারে অর্ধাহারে তাদের দিন কাটাতে হয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞের একটি খন্ডচিত্র হল গারুড়িয়া ও খয়রাবাদ গণহত্যা। বাংলাদেশের বিভিন্ন

অঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার এরকম অনেক চিত্র রয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পৈশাচিকতা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানাতে হবে। আর এভাবেই নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে গড়ে তুলবে সোনার বাংলা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১৯৭১ সালে গারুড়িয়া ও খয়রাবাদে সংঘঠিত গণহত্যার তথ্য সংগ্রহের সময় অনেকেই ঐ সময়ে যা দেখেছেন সে সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তবে গণহত্যার সেই স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে অনেকেই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তথ্য সংগ্রহে আমাকে স্থানীয়ভাবে যারা সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে জনাব দিলীপ চ্যাটার্জী, জনাব মিলন মালাকর, জনাব ঝন্টুলাল মালাকর, অলোক কুমার, জনাব সুশান্ত হালদার, জনাব মো: কেরামত আলী হাওলাদার, সুনীল সরকেল প্রমুখ কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। গারুড়িয়া ও খয়রাবাদ গণহত্যার সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, মিছিল-মিটিং ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুলাদী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ জনাব আনোয়ারুল কবির স্যার আমাকে সর্বাত্মক সাহায্য করেছেন। সেজন্য তাকেও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে উক্ত গবেষণা পেপারে সম্পাদনায় সহযোগিতা করার জন্য ড. চিত্ত রনজন সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্যসূত্র:

১. সরকার, সি আর ও সন্ধ্যা পারুল সরকার। **১৯৭১** সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: বরিশালের গাভা বধ্যভূমিতে গনহত্যার একটি কেস স্টাডি। ভলিউম **১০**, ইস্যু ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪। পাতা **১০১-১১৪**।

২. সুষমিতা রানী দাস ও অন্যান্য। Genocide in the Liberation War of Bangladesh: A Case Study on Sreepur Genocide, Noakhali। Vol: VI, Issue-I, September 2020।

৩. ঘোষ, সুশান্ত। মুক্তিযুদ্ধে কিশোর ইতিহাস। বরিশাল, ২০১৭।

৪. মন্ডল, দিলীপ কুমার। একাত্তররের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা। সুন্দরবন সংলগ্ন জেলা, ২০১৭।

৫. জালালউদ্দীন, টি.এম। ঐতিহ্যবাহী বরিশাল। বরিশাল, স্মৃতিপ্রকাশ।

৬. মঈদুল হাসান (প্রধান সম্পাদক)। মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল। প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীর বিবরণ।

৭. বিবিএস, জেলা পরিসংখ্যান ২০১১। বরিশাল জেলা। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস।